আত্মবিনাশী বাংলাদেশঃ

অভাব যেখানে দর্শনের

ফিরোজ মাহবুব কামাল

বাংলাদেশের ব্যর্থতা নিয়ে বিতর্ক নেই। শয্যাশায়ী রোগী পচনে পচনে যখন দুর্গন্ধ ছড়ায় তখন সে রোগ শুধু ঘরের লোকই নয় প্রতিবেশীও টের পায়। বাংলাদেশের বেলায় সেটিই ঘটেছে। দেশটির পচন মূলতঃ নৈতিক। সে নৈতিক পচনের বড় আলামত হলো দূর্নীতি। দূর্নীতিগ্রস্ত দেশ হিসাবে বাংলাদেশের পরিচিতি আজ বিশ্বময়। নানাদেশের কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নয়নের মডেল রূপে যেখানে আলোচিত হয় জাপান, কোরিয়া বা সিঙ্গাপুর, বাংলাদেশ সেখানে ব্যর্থতার মডেল। অতিশয় বিশাল হয়েও ডায়নোসর যেমন বিশ্ব থেকে হারিয়ে গিয়ে ইতিহাস গড়েছে তেমনি বাংলাদেশের ১৩ কোটি মানুষের বিশাল জনগোষ্ঠি ইতিহাস গড়েছে দ্রুত নীচে নামায়। দেশটি সবচেয়ে তলায় নেমেছে দূর্নীতিতে বিশ্বে প্রথম হয়ে। কিন্তু প্রশ্ন হলো কেন এ ব্যর্থতা? অনেকেই ভাবেন এ ব্যর্থতার মূল কারণ বিশাল জনসংখ্যা। বাংলাদেশের প্রশাসন মূলতঃ এ মতের ধারকদের দখলে। ফলে শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও অন্যসব উন্নয়ন-পরিকল্পনার চেয়ে গুরুত্ব দেওয়া হয় জন্মনিয়ন্ত্রণকে। তাই স্বাস্থ্য, শিক্ষা, শিল্প বা কৃষির গুরুত্ব বুঝাতে ঘরে ঘরে কোন সরকারি কর্মচারির পদধুলি পড়ে না। কিন্তু কনডম বা জননিয়ন্ত্রন বড়ি হাতে প্রতিমাসে প্রতি ঘরে কেউ না কেউ পৌঁছবেই। বাংলাদেশ সরকারের সবচেয়ে স্বচ্ছল বিভাগ হলো এটি। বিদেশী ঋণদাতাদেরও সর্বাধিক নজর এ বিভাগটির উপর। বাংলাদেশের জন্মলগ্ন থেকে এ অবধি যত বিদেশী অর্থ এ বিভাগটি পেয়েছে আর কোন বিভাগ তা পায়নি। কিন্তু প্রশ্ন হলো, এত বিণিয়োগ ও এত মেহনতের পরও দেশ কি সামনে এগিয়েছে?

প্রশ্ন হলো, জনসংখ্যাবৃদ্ধিকে সমস্যা মনে করা কি ইসলামে জায়েজ? এটি অতি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। কারণ মুসলমানের ঈমান শুধ হালাল পানাহারে বাঁচে না, ধ্যাণ-ধারণা ও দর্শনকেও এজন্য হালাল হতে হয়। তাই জনসংখ্যাবৃদ্ধিও প্রশ্নটি নিছক অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও সমাজনীতির বিষয় নয়, এটি অতি আক্বিদাগত বিষয়ও। এর সাথে জড়িত মুসলমান থাকা না থাকার প্রশ্ন। আল্লাহর সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি তথা আশরাফুল মাখলুকাত হলো মানুষ; সোনা-রূপা, তেল-গ্যাস বা কোন জীবজন্তু নয়। মানুষ শুধু শ্রেষ্ঠ-সৃষ্টিই নয় বরং আল্লাহর খলিফা। আল্লাহর এ খলিফার মর্যাদা ফেরেশতার চেয়েও উর্দ্ধে। নামায-রোযার ন্যায় এ বিশ্বাসটির ধারণও ফরয, নইলে মুসলমান হওয়া যায় না। কোন শিল্পির শ্রেষ্ঠ শিল্পকে তুচ্ছ বলার অর্থ সে শিল্পিকে অবমাননা করা। তেমনি আল্লাহর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষকে আপদ বললে অবমাননা হয় মহান আল্লাহর। হেয় করা হয় তার কুদরতকে। নামায পড়ে বা রোযা রেখে সে অবমাননা কি মোচন হয়? তাঁর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টির প্রতি এমন অবজ্ঞা নিয়ে মুসলমান পেতে পারে কি আল্লাহর রহমত? এমন চিন্তা বিবেকের পচনেই সম্ভব, সুস্থ্যতায় নয়। এবং সে পচনে বাংলাদেশী মুসলমানেরা যে বহুদূর এগিয়েছে সে প্রমাণই কি কম? এ পচনের কারণে সূদ-ঘুষ-দূর্নীতির ন্যায় হারাম কর্ম বাংলাদেশে আচারে পরিণত হয়েছে। পাপকে বৈধতা দিয়ে পতিতাপল্লী প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। সরকার জনগণের জানমালের নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ হলে কি হবে, সফল ভাবে পাহারাদারি দিচ্ছে সে ব্যভিচারের। দেশে গবাদি পশুকে আপদ ভাবা হয় না। বরং সবাই তার বংশ-বিস্তার চায়। কিন্তু সে মর্যাদা মানুষের নেই। ফলে লক্ষ লক্ষ মানুষ মরছে জন্মানোর আগেই। এ্যাবরশনের নামে দেশজুড়ে নীরবে গণহত্যা চলছে। দেশী-বিদেশী অর্থে অসংখ্য এনজিও কর্মী একাজে খুনীর বেশে নেমেছে। ইউরোপ ও আমেরিকার অমুসলিম দেশেগুলিতেও এ্যাবরশনের নামে এরূপ মানবহত্যার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হয়। আন্দোলনও হয়। কিন্তু বাংলাদেশে সেটি নেই। সরকার, জনগণ, মসজিদের ইমাম, সাংবাদিক, বুদ্ধিজীবী এবং রাজনৈতিক দলের নেতারা এসব জেনেও না জানার ভান করে। বরং জনসংখ্যা এভাবে কমানোতে অনেকেই খুশি। ফলে জন্ম নিচ্ছে না মায়ের পেটে জন্ম নেওয়া শিশুদের বাঁচানোর পক্ষে আন্দোলন। এমন মৃত-বিবেক ও বিকৃত চেতনার ফলে মানুষ হারিয়েছে তার নিজের মূল্যমান। শিশুহত্যার পাশাপাশি খুণীদের হাত পড়ছে জীবিতদের গলায়ও। ফলে বেড়ে চলেছে হত্যা, ধর্ষণ ও সন্ত্রাস। আগুণ দেওয়া হচ্ছে যাত্রীভর্তি বাসে। ধর্ষনেও উৎসব হচ্ছে। মানুষ বিবস্ত্র ও লাঞ্ছিত হচ্ছে প্রকাশ্য রাজপথে।

সম্পদের অভাবকে যারা সকল ব্যর্থতার কারণ বলেন তাদের বিভ্রান্তিও কি কম? তাদের কথা, অভাব থেকেই স্বভাব নষ্ট হয়েছে। অথচ সবচেয়ে নষ্ট চরিত্র ও নষ্ট স্বভাব হলো বাংলাদেশের ধনীদের। দেশের অধিকাংশ ঘুষখোর, সূদখোর, মদখোর, ব্যভিচারি, সন্ত্রাসী, দুর্বৃত্ত রাজনীতিবিদ ও ঋণখেলাফী এসেছে তাদের মধ্য থেকে। অথচ বহু অভাবগ্রস্ত ব্যক্তি স্বভাব-চরিত্রে অতি উত্তম দৃষ্টান্ত রাখছে। কথা হলো দর্শন, শিক্ষা, সংস্কৃতি, রাজনীতি ও অর্থনীতির প্রতি পদে যারা ব্যর্থ তারা কি সম্পদ সৃষ্টি করে? বরং আনে দারিদ্র্য। সম্পদ মানুষের সৃষ্টি এবং এ জন্য চাই সৃষ্টিশীল মানুষ। এমন মানুষ গড়ে উঠে শুধু দেহের গুণে নয়, বরং মনের গুণে। আর এমন মানবিক ভাবে বেড়ে উঠার জন্য চাই উপযুক্ত শিক্ষা ও দর্শন। অশিক্ষা, অপসংস্কৃতি ও দূর্নীতি একটি জনগোষ্টিকে শুধু সৃষ্টিহীনই করে না, অনাসৃষ্টিপূর্ণও করে। দারিদ্র্য ও দূর্ভিক্ষ এমন দেশের নিয়তি হয়ে দাঁড়ায়। বাংলাদেশের বেলায় সেটিই হয়েছে।

এদেশে দারিদ্র্য জন্ম নিয়েছে সর্ববিধ ব্যর্থতা থেকে, জাতির ব্যর্থতা দারিদ্র্যের কারণে নয়। বিশ্বের অন্যতম ক্ষুদ্র দেশ হলো সিঙ্গাপুর। আয়তন মাত্র ২৪০ বর্গ মাইল। জনসংখ্যা ৪৫ লাখ। আয়তনে ও লোকসংখ্যায় ঢাকা শহরের চেয়েও ক্ষুদ্রতর। প্রতি বর্গমাইলে জনসংখ্যার ঘনত্ব বাংলাদেশের চেয়ে বহুগুণ বেশী। অথচ দেশটির বাৎসরিক বৈদেশিক রফতানি ২২৩.৯ বিলিয়ন ডলার (২০০২ সালের পরিসংখ্যান মতে)। অথচ ২০০৩ সালে বাংলাদেশের বৈদেশিক রফতানি ছিল মাত্র ৬.৫ বিলিয়ন ডলার। এবং এটি ছিল ঐ বছরের আমদানীর চেয়ে ৩.১ বিলিয়ন ডলার কম। অথচ সিঙ্গাপুরের রফতানি ছিল তাদের আমদানির চেয়ে ১৫.৬ বিলিয়ন ডলার অধিক। বাংলাদেশ যেখানে এক বছরে তিন বিলিয়ন ডলারের বাণিজ্যিক ঘাটতি টেনেছে সেখানে সিঙ্গাপুরের উদ্বৃত্ত ছিল বাংলাদেশের সমুদয় রফতানির দ্বিগুণ। সোনার খনি বা তেলের খনি নিয়ে সিঙ্গাপুর এ অর্থনৈতিক সাফল্য অর্জন করেনি। বরং এ সাফল্য এনেছে দেশটির সৃষ্টিশীল মানুষ। মানুষকে তারা আপদ ভাবেনি বরং সোনার বা তেলের খনির চেয়েও মহামূল্যবান ভেবে তাদের উন্নয়নে মনযোগী হয়েছে। ফলে তাদের মাথাপিছু যে উৎপাদন ক্ষমতা তা বাংলাদেশের বহু হাজার মানুষের মধ্যেও সৃষ্টি হয়নি।

বাংলাদেশের অভাব মূলতঃ দর্শন বা ফিলোসফিতে। অথচ একটি দেশের অগ্রগতি বা বিজয় শুরু হয় এখান থেকেই। তাই যারা দেশ গড়তে চায় তারা মানুষের বিশ্বাসে বা দর্শনে হাত দেয়। ইসলামের আগমনে আরবের ভূগোলে বা জলবায়ুতে পরিবর্তন আসে নি। মাটির তলায় সোনার খনি বা তেলের খনিও আবিস্কৃত হয়নি। পরিবর্তন আসেনি মানুষের দৈহিক আকার-আকৃতি বা অবয়বে। বরং বিপ্লব এসেছিল তাদের জীবন দর্শনে। পরিবর্তন এসেছিল চিন্তার মডেলে। সে পরিবর্তনের ফলে জীবন ও জগত নিয়ে মানুষের ধ্যানধারণাই পাল্টে গিয়েছিল। পরিবর্তন এসেছিল তাদের কর্মে ও আচরণে। সে পরিবর্তনের পথ ধরে পাল্টে গিয়েছিল মধপ্রাচ্যের ভূগোল, ভাষা, রাজনীতি, অর্থনীতি, সংস্কৃতি তথা সবকিছু। দর্শনের শক্তির কাছে পারমানবিক শক্তিও অতি তুচ্ছ। পারমানবিক শক্তি বলে আলোকিত হয় কিছু শহর, চালিত হয় কিছু কলকারখানা, জাহাজ বা সাবমেরিন। অথচ দর্শন আলোকিত করে এবং পাল্টে দেয় কোটি কোটি মানুষের জীবন ও জগত। পাল্টে দিতে পারে বিশ্বের মানচিত্র। এক্ষেত্রে ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ উদাহরন পেশ করেছে ইসলাম। দর্শনের বলেই নিঃস্ব আরবেরা বিশ্বের সুপার পাওয়ারে পরিণত হয়েছিল। পাল্টে দিয়েছিল তাদের সংস্কৃতি, রাজনীতি ও রুচীবোধ। ইসলামের পূর্বে আরবের মানুষ ভাবতো জীবনের শুরু ও শেষ ইহলোকেই, পরকাল বা বিচার দিন বলে কিছু নেই। ভাবতো, মৃত্যুর পর তাদের হাড্ডিমাংস মাটিতে মিশে যাবে এবং ধুলায় হারিয়ে যাবে চিরতরে। ফলে সকল প্রচেষ্টা নিয়োজিত করতো এ দুনিয়ার জীবনকে আনন্দময় করতে। বাংলাদেশে আজ যারা ঘুষ খায়, সূদ খায়, ব্যভিচারি করে বা এ্যাবরশন করে নিজ সন্তান হত্যা করে তাদের মত তারাও সেদিন সন্ত্রাস করতো, মদ খেতো, ব্যভিচারি করতো, এমনকি নিজ সন্তানদেরকেও জীবন্ত করব দিত।

যে দর্শনটি আরবদের জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছিল তার মূল উপাদানটি ছিল মানব জীবনের সঠিক ধারণা। সে আমলে গ্রহ-নক্ষত্রের পরিচয় না জানলেও তারা নিজেদের পরিচয়কে জেনেছিলেন সঠিক ভাবেই। এবং সেটি জেনেছিলেন যিনি স্বয়ং এ জীবন ও জগতের স্রষ্টা তাঁর কাছ থেকে। নবী (সাঃ) মারফত মহান আল্লাহপাক থেকে। ফলে জেনেছিলেন, ইহকালীন এ জীবন অনন্ত অসীম জীবনের শুরু-পর্ব মাত্র। এ জীবন শেষে যেমন পুরস্কার বা প্রমোশন আছে তেমনি শাস্তি বা ডিমোশনও আছে। প্রমোশন ও ডিমোশন নির্ধারণে পরীক্ষাও আছে। দুনিয়ার এ জীবন মূলতঃ সেই পরীক্ষাকেন্দ্র। পরীক্ষা নেওয়াটিই হলো ইহকালীন জীবনের মূল লক্ষ্য। মৃত্যুর মধ্য দিয়ে পরীক্ষার সমাপ্তি হয়, তবে জীবনের সমাপ্তি ঘটে না। শুরু হয় ফলাফল ভোগের পালা। মহান আল্লাহতায়ালার সে ঘোষনাটি এসেছে এভাবেঃ "আল্লাযী খালাকাল মাওতা ওয়াল হায়াতা লি ইয়াবলুয়াকুম আইয়োকুম আহসানা আমালা (সুরা মুলক আয়াত-১)।" অর্থঃ তিনি মৃত্যু ও জীবনকে এ জন্য সৃষ্টি করেছেন যে তিনি পরীক্ষা করবেন তোমাদের মধ্যে কে আমলের দিক দিয়ে উত্তম। বস্তুতঃ মানব জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পাঠ হলো কোরআনের এ ঘোষণা। এটুকু না জানা হলে জীবনে সবজানা ব্যর্থ হয়ে যায়। পরীক্ষার হলকে তখন নাট্যশালা, পানশালা বা কর্মশালা মনে হয়। মানুষ মত্ত হয় তখন ফূর্তিতে। কর্মজীবী, বুদ্ধিজীবী, ব্যবসায়ী বা পেশাদার রূপে জীবনে সফল হওয়াটাই জীবনের মূল লক্ষ্যে পরিণত হয়। উপার্জন, আনন্দ-উল্লাস বা নিছক সময় কাটানোই বাঁচবার উদ্দেশ্য মনে হয়। জানাই হয় না যে এ জীবন একটি পরীক্ষা কেন্দ্র। নিদারুন অজ্ঞতা থেকে যায় কিসে সফলতা এবং কিসে বিফলতা সে বিষয়েও। অথচ এ পরম সত্যটুকু জানাতেই নবীগণ এসেছিলেন। এবং নাযিল হয়েছিল অন্যান্য আসমানি কিতাব ও পবিত্র কোরআন।

পরীক্ষাকালে কেউ নাচগান, আমোদ-ফুর্তি করে না। অলস অবকাশে অনর্থক সময়ও কাটায় না। বরং পায়খানা প্রশ্রাবের ন্যায় জরুরী কাজ আটকিয়ে রেখে সময়কে কাজে লাগায়। এ ভয়ে না জানি প্রশ্নপত্র অসম্পন্ন থেকে যায়। তখন প্রতি মুহূর্তের চেষ্টা, পরীক্ষার খাতায় কি করে নাম্বার বাড়ানো যায়। সাহাবায়ে কেরাম এ জীবনকে পরীক্ষাপর্ব রূপে গ্রহন করেছিলেন বলেই তারা দিবারাত্র নেক আমলে ব্যস্ত থাকতেন। নেক আমলে তাড়াহুড়া ছিল তাদের সর্ব-অস্তিত্ব জুড়ে। পবিত্র কোরআনেও সেটিরই তাগিদ এসেছে এভাবেঃ 'সা'রিয়ু ইলা মাগফিরাতিম মির রাব্বিকুম' (সুরা আল ইমরান)। অর্থঃ তাড়াহুড়া কর তোমার রব থেকে মাগফিরাত লাভে।' কারণ, পরীক্ষার শেষ ঘন্টা যখন তখন বীনা নোটিশে বেজে উঠতে পারে। তাই সন্নাসী সেজে সমাজ-সংসার, অর্থনীতি-রাজনীতি, শিক্ষা-সংস্কৃতি, দাওয়াত ও জিহাদের ন্যায় গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র থেকে হাত গুটিয়ে বসে থাকার সুযোগ ইসলামে নেই। সাহাবায়ে কেরাম

যেমন অবিরাম দ্বীনের দাওয়াত দিয়েছেন, তেমনি রাজনীতি ও প্রশাসনে নেমেছেন। জ্ঞানচর্চা যেমন করেছেন তেমনি জিহাদেও নেমেছেন। কর্মময় ছিলেন প্রতি ক্ষেত্রে। রাতে না ঘুমিয়ে অভাবী মানুষ খুজেছেন। খলিফা হয়েও পিঠে আটার বস্তা নিয়ে গরীবের ঘরে ছুটেছেন। উটের পিঠে চাকরকে বসিয়ে নিজে রশি টেনেছেন। ইসলামের দাওয়াত নিয়ে পাহাড়-পর্বত, নদ-নদী, মরুভূমি ও সাগর অতিক্রম করেছেন। যখন কাগজ-কলম আবিস্কৃত হয়নি তখনও তারা জ্ঞানচর্চায় ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন।

ঈমানদারের কল্যাণধর্মী প্রতিটি কর্মই হলো ইবাদত। নেক আমল এগুলিই। এতে সঞ্চয় বাড়ে আখেরাতের এ্যাকাউন্টে। সৃষ্টিশীল প্রতিটি মুসলমান এভাবেই পরিনত হয় শক্তিশালী পাওয়ার হাউসে। প্রকৃত ঈমানদারের এ সৃষ্টশীলতা বলিষ্ঠ ভাবে তুলে ধরেছেন আল্লামা ইকবাল তার ফার্সি কবিতায়। লিখেছেনঃ 'হরকে উ'রা লিয্যাতে তাখলিক নিস্ত, পিশে মা জুজে কাফির ও যিনদিক নিস্ত।' অর্থঃ 'যার মধ্যে নাই সৃজনশীলতা, আমাদের কাছে সে কাফির ও নাস্তিকভিন্ন অন্য কিছূ নয়।' পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে, 'ওয়া লি কুল্লে দারাজাতিন মিম্মা আমেলু' অর্থঃ এবং মানুষের সকল মর্যাদা নির্ধারিত হবে তার কর্মের মধ্য দিয়ে। অর্থাৎ যার জীবনে কর্ম নেই (আল্লাহর কাছে) তার মর্যাদাও নেই। তাই কর্মহীন পরগাছা জীবন দ্বীনদারি নয়, এটি ধর্মহীনতা। মুসলমানতো যিকর করবে কর্মের মধ্যে থেকে। উত্তম চাষ ও বীজ ছিটানোর পরই রেযেক বৃদ্ধিতে সে আল্লাহর রহমত চাইবে। আল্লাহর কাছে বিজয় চাইবে জিহাদের ময়দানে দাঁড়িয়ে। কারণ, সাহায্যদানের পূর্বে আল্লাহতায়ালা বান্দাহর নিজের প্রস্তুতি কতটুকু সেটিও দেখতে চান। মুসলমানেরা তখনই বিশাল বিশাল বাহিনীর বিরুদ্ধে বিজয়ী হয়েছেন যখন সে লক্ষ্যে নিজেদের প্রাণ কোরবানীতে দু'পায়ে দাঁড়িয়েছিলেন। মুসলমানদের এমন প্রস্তুতি দেখে আল্লাহতায়ালা তাদের দোয়ার জবাব দিয়েছিলেন ফেরেশতা পাঠিয়ে। জিহাদ ছেড়ে জায়নামাযে দাঁড়িয়ে মুসলমানেরা যখন বিজয় চাওয়া শুরু করেছে তখনই পরাজয় শুরু হয়েছে। আজ মুসলিম বিশ্বের কোটি কোটি মানুষের দোয়া আফগানিস্তান, ইরাক, ফিলিস্তিন, কাশ্মির ও চেচনিয়ার মুসলমানদেরকে জালেমদের হাত থেকে বাঁচাতে যে ব্যর্থ হচ্ছে তার কারণ তো এটি। মুসলমানের যুদ্ধবিগ্রহ, জ্ঞানার্জন, রাজনীতি, ব্যবসাবাণিজ্য, চাষাবাদ, শিক্ষকতা, চিকিৎস্যকতা, লেখালেখি আদৌ দুনিয়াদারি নয় বরং এর প্রতিটিই হলো নেক আমল বা ইবাদত। পথের কাঁটা সরানো যেখানে উত্তম নেক আমল সেখানে গলার কাঁটা বা সমাজ, রাষ্ট্র বা বিশ্বের কাঁটা সরানো কি দুনিয়ারি হতে পারে?

ইসলামের প্রাথমিক যুগে আরবের বিরান মরুভূমিতে যে বিশ্ব-শক্তি জন্ম নিয়েছিল সমগ্র মুসলিম ইতিহাসে আজও সেটিই সর্বাধিক গৌরবের। সেটি সম্ভব হয়েছিল কয়েক লাখ সৃষ্টিশীল মানুষের কারণে। তাদের একজনের সামর্থ বাংলাদেশের একেটি জেলাতেও সৃষ্টি হয়নি। তারা শুধু সম্পদেই সমৃদ্ধি আনেননি, বিপুল সমৃদ্ধি এনেছিলেন জীবনদর্শন তথা ফিলোসফিতে। আজকের দেড়শত কোটি মুসলমানের অর্জন সে তুলনায় অতি তুচ্ছ। দর্শনই দেয় দূর্নীতির বিরুদ্ধে ইম্যুউনিটি বা প্রতিরোধশক্তি। দেয় চারিত্রিক বল। নির্মাণ করে নৈতিক মেরুদন্ড। নিছক উৎপাদন বাড়িয়ে দর্শনের এ দারিদ্র্য দূর হয়না। অর্জিত হয় না চারিত্রিক সুস্থ্যতা। বাংলাদেশে তাই কৃষি বা শিল্প-উৎপাদন বাড়লেও ডুবছে দূর্নীতির প্লাবনে। ধ্বসেছে মেরুদন্ড। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, পত্র-পত্রিকা ও মসজিদ-মাদ্রাসা এবং বুদ্ধিজীবীদের মূল কাজ ছিল দর্শনে সমৃদ্ধি আনা। জ্ঞানার্জন ইসলামে ফরয করা হয়েছে একারণেই। কারণ এর মাধ্যমেই ব্যক্তি পায় তাকওয়া এবং খাদ্য পায় ব্যাক্তির রুহ বা আত্মা। ব্যক্তির রুহ যেমন এছাড়া পুষ্টি পায় না তেমনি ঈমানও বাঁচে না। নবীপাক (সাঃ) এজন্যই এক মুহুর্তের জ্ঞানার্জনকে সারা রাতের নফল ইবাদতের চেয়ে শ্রেষ্ঠ বলেছেন। জ্ঞানীর কলমের কালীকে শহীদের রক্তের চেয়েও পবিত্র বলেছেন। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়া এজন্যই সাদকায়ে জারিয়া। কিন্তু বাংলাদেশে জ্ঞানার্জনের সে কাজটিই হয়নি। এটিই বাংলাদেশের সবচেয়ে ব্যর্থ খাত। চাষিরা ও শ্রমিকেরা ক্ষেতে খামারে ও কারখানায় যতটুকু অগ্রগতি এনেছে বুদ্ধিজীবী ও শিক্ষকেরা তা বিদ্যালয়ে পারিনি। মসজিদ-মাদ্রাসা ও কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় দেশে প্রচুর বেড়েছে। বেড়েছে শিক্ষিতের হার। কিন্তু জনমন সমৃদ্ধ হয়নি সুস্থ্য দর্শনে। বাড়িনি চরিত্র। যে শিক্ষা দূর্নীতি, সন্ত্রাস ও পাপাচার বাড়ায় তাকে কি ইবাদত বলা যায়? এটি তো পাপাচার। অথচ বাংলাদেশে সেটিই হচ্ছে। এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো জীবনের অতি মূল পাঠটিও শিখাতে পারিনি। ফলে বেড়ে উঠেনি নৈতিক মেরুদন্ড সম্পন্ন সাহসী সৈনিক যারা দেশকে দুর্বৃত্তমূক্ত করবে। বরং কুশিক্ষা জীবনকে রঙ্গশালা ভাবতে শিখিয়েছে। উৎপাদন বাড়িয়েছে অসংখ্য দুর্বৃত্তের যারা দখল জমিয়েছে দেশের রাজনীতি, প্রশাসন, অর্থনীতি, সাহিত্য-সংস্কৃতিসহ সর্বক্ষেত্রে। ফলে ব্যর্থতা বেড়েছে সর্বস্তরে। ভ্রষ্টতার শিকার আলেম সম্প্রদায়ও। আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠার রাজনীতি যেখানে ফরয, এবং যে রাজনৈতিক অধিকার জমাতে অর্থদান, শ্রমদান এমনকি জীবন দানে জিহাদে নামেন নি এমন কোন সাহাবী পাওয়া যাবে না সে রাজনীতিকে এরা দুনিয়াদারি বলছে। এবং দ্বীনদারি বলছে দুর্বৃত্তদের সাথে আপোষ ও সহযোগিতাকে। দেশ সর্বার্থেই আজ আত্মবিনাশের পথে। এ ব্যর্থতার জন্য অন্যদের দোষ দিয়ে লাভ নেই। যে দেশ আত্মহননের পথে নিজেই ধেয়ে চলছে সে দেশের বিনাশে বিদেশী শত্রুর প্রয়োজন আছে কি? এমূহুর্তে বাঁচতে হলে জাতিকে ফিরিয়ে নিতে জীবনের মূল পাঠের দিকে যা আল্লাহপাক নবীদের মারফত শিখিয়েছেন। আত্মাবিনাশী আরবরা এ পথেই বিশ্বশক্তিতে পরিণত হয়েছিল। বাংলাদেশের সামনেও এ ছাড়া বাঁচবার আর কোন পথ খোলা আছে কি?

লন্ডন ১০/১০/২০০৪